গদ্য প্রবাহ ও লেখকের মন—
ব্রাত্য বসু রচিত অদামৃতকথা

উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়

ব্রাত্য বসু রচিত ''অদামৃতকথা'' উপন্যাসের সপ্তম অধ্যায়ে ভুনিকে পত্র লিখছেন 'অদা' — ১১ আষাঢ়, ১৩১২ সন, বাগবাজার। এই পত্রটির মধ্যে মনে হয় সম্পূর্ণ গদ্য রচনাটির মূল অবয়বটি ধরা আছে এবং লেখাটি বেশ খানিকটা এগোনোর পরে এই পত্রটি রাখছেন লেখক। এই চিঠি আসলে লিখছেন ব্রাত্য। ইতিহাসের মধ্যে যে সম্পর্ক বিধৃত তাকে একটি মরমী চিঠির মধ্যে দিয়ে লিখছেন — অর্ধেন্দুশেখর লিখছেন বলে মনে হবে, আসলে লিখছেন লেখক ব্রাত্য যিনি এক হিসেবে বর্ণনাকারী বা ন্যারেটার। আবার এই ন্যারেটার এমনভাবে সরে যাচ্ছেন, নিজেকে লুকিয়ে নিচ্ছেন যে একই সঙ্গে চরিত্রগুলির মাঝে ও বাহিরে থাকতে পারছেন পাঠক। এই ভিতর ও বাহিরের কারুকাজ, গদ্যের বিচিত্র মিশ্রণ এবং ন্যারেটার হিসাবে বিষয়ের ক্রম-উন্মোচন এই তিনটি বিষয় নিয়ে কিছু বলবার চেষ্টা করব। একথা অবশ্য স্মর্তব্য যে থিয়েটারের চালচিত্র নিয়ে এমন সূত্রনির্ভর অনুপুঙ্খ রচনা আমরা আগে পড়িনি। নাট্যকার নাটককার পণ্ডিত ব্রাত্য তাঁর উপন্যাসে বেছে নিলেন থিয়েটারকেই — এবং অতীতকে। এর সঙ্গে উল্লেখ্য শিশিরকুমারের জীবন নিয়ে ''দ্যূতক্রীড়ক'' — সুনীলের উপন্যাস ''নিঃসঙ্গ সম্রাট''-এর যে কাহিনি বলে যাবার বা মর্মস্পর্শী আখ্যান তৈরি করবার জন্য কল্পিত কাহিনির আশ্রয় নেওয়া, এইসব দিক দিয়ে ব্রাত্য যাননি। শিশিরকুমার বিষয়ে উপন্যাসেও তিনি ইতিহাসের বয়ান মেনে নির্মাণ করেছেন চরিত্র ও ঘটনাপ্রবাহকে। সেই গতিপথ ''অদামৃতকথা''য় দেখা যায় স্পষ্টই।

গদ্যভাষা

> ''অতএব এই বড়ুয়া মঙ্গলের দিনে, অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহ অবলোকনকল্পে, সমাগত প্রাবৃট দিনান্ত শোভা সমগ্র জাহ্নবীর বসন্তবায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় প্রতিফলিত হচ্ছিল''

> ''অনন্তর, ১৮৭৭ র গভীর গ্রীষ্মে খিদিরপুর ডক থেকে পোর্ট ব্লেয়ারগামী অর্ণব পোতটি ছাড়ার কিছুক্ষণ বাদেই নীলনিভ আকাশের মধ্যস্থল থেকে সীমান্ত পর্যন্ত কালবৈশাখী চমকিতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে অতি গম্ভীর মেঘগর্জন শুরু হল। মাঝে মাঝেই শোঁ শোঁ রবে বিষম বাত্যা। কিছুক্ষণের মধ্যে দিবসভাগে প্রজ্জ্বলিত মার্তণ্ডের মুখে যবনিকা টেনে, অনন্ত বিস্তৃত এক গাঢ় তমিস্রা নেমে এল''

''এই অবিমিশ্র স্মৃতিলহরী নিয়ে অমৃত এখন কী করবে? আসন্ন ভবিষ্যতের অনিশ্চিত পদক্ষেপ, বৃহৎ তরঙ্গমালার উপর দোদুল্যমান সুবিস্তৃত অর্ণবপোত, কেবিন গবাক্ষের বাইরে সমুদ্রাম্বুসঞ্চারী বাত্যারাশির হুংকারের ঘটা। ঘন ঘন তূর্যনাদবৎ বজ্রনিনাদ। নভোমণ্ডলের অনন্ত সংখ্যক তারকামালা আবৃতকারী মুহুর্মুহু শিলাপ্রস্তর যুক্ত বৃষ্টিপাত। সেইসঙ্গে জঠর থেকে উত্থিত একটি মস্তক টলায়মানকারী...তিন্তিড়ি অম্লসম অগ্নিমান্দ্য ভাব... অমৃতকে থেকে থেকে অতীতমুখী করে তুলছিল''

এই তিনটি উদাহরণকে দেখা যাক। বঙ্কিমি ভাষার একটি সমাপতন ঘটেছে শব্দ ব্যবহারে কিন্তু ক্রিয়া পদগুলি চলতি যেমন (ক) ছাড়ার (খ) লাগল (গ) শুরু হল (ঘ) যবনিকা টেনে (ঙ) নেমে এল (চ) করে তুলছিল (ছ) প্রতিফলিত হচ্ছিল। সঙ্গে — অর্ণবপোত, বাত্যা, মার্তণ্ড, তমিস্রা, নভোমণ্ডল, তূর্যনাবদৎ, তিন্তিড়িঅম্লসম — ইত্যাদি। প্রথম অধ্যায় এবং পঞ্চম অধ্যায় থেকে এই উদাহরণগুলি গৃহীত। প্রথম অধ্যায়ে কাহিনিপট তীব্র নাটকীয়তা পায় নবীন সেনের পাশে দাঁড়ানো অমৃতলালের থেকে (সুরসিক, দুষ্ট রাঢ়ি, অধরে রহস্যময় পরাঙ্মুখ নালিঘাসসম দলমালাময়ী হাস্য), যার মনে ভাসছে অর্ধেন্দুর মুখ এবং নিজের থিয়েটার করবার সিদ্ধান্ত। অমৃতলালের মনে অর্ধেন্দুর স্মৃতি অমৃতকে বলছে অর্ধেন্দুর বিপরীতে মঞ্চে দাঁড়াতে। এই গভীর বিষয়টি যা একটি প্রেম — বয়ে চলবে শেষ অবদি যতক্ষণ না পুরুষ রসরাজ অমৃত বোসের সঙ্গে তার ভিতরে থাকা ভুনি নামক নারীর দেখা হচ্ছে। ১৮৭৭-এর গরমকালে থিয়েটার ছেড়ে অমৃত কালাপানি পাড়ি দিলেন পুলিশের চাকরি নিয়ে। এইটি একটি তুঙ্গ সময়বিন্দু এই লেখাটির। এক তীব্র পরিবর্তন চলছে চরিত্রের মনে। ব্রাত্য আমাদের হাত ধরে অমৃতের মনের মধ্যে নিয়ে আসেন এবং নিজে যেন মুচকি হাসেন তফাতে দাঁড়িয়ে, তাই ''জীবনগ্রন্থের ভস্মরাজির স্মৃতি তার অন্যমনস্ক কপোলতলে, দ্রুত পরম্পরায় পটের চিত্রের মতো চলে যাচ্ছিল। এই অবিমিশ্র স্মৃতিলহরী নিয়ে অমৃত এখন কী করবে?'' এই চিন্তাকুল ব্যক্তির মনোরথে চড়ে আমরা চলে গেলাম ড্রামাটিক পারফর্মেন্স অর্ডিন্যান্স-এ, হেমচন্দ্রের 'বাজিমাত'-এ, গিরিশে, ন্যাশনাল থিয়েটার-এ বারাঙ্গনা আগমনে (যেথা গোলাপ এলোকেশী শ্যামাসুন্দরী ও জগত্তারিণী) — ধর্মদাস সুরের কার্যকলাপে এবং ''গিরিশচন্দ্র তখন বাংলা থিয়েটারের অধিপতি, কিন্তু কালের নিগড়ে প্রতিভাবান বোহেমিয়ান অর্ধেন্দুশেখর প্রতিপত্তিতে তখন তাঁর অনেক পিছনে''

কিন্তু অমৃত যখন জেলে ছিল অর্ধেন্দু তার খবর নেয়নি — চোখ ফেটে জল আসছিল অমৃতর। আবার সময় চিহ্নকে ধরে দেন ন্যারেটর। ''থিয়েটারে ব্যক্তিগত মুখ শোঁকাশুঁকি কি তবে ভবিতব্য? শিল্প থাকবে, তার চর্চা থাকবে, আর লবির লোক না হলে, পছন্দ না হলে, হয় নীরব থাকবে না হলে এইভাবে হুতোম কথিত 'কমোডে হাগেন এবং কাগজে পোঁদ পোছেন' করে ছেড়ে দেবে?'' ন্যারেটার নিজের মন অমৃতর মনে এনে দিলেন, বাহবা, বাহবা, বাহবা এবং এমন এক সত্যকে বলছেন যা আজও তীব্রতম সত্য। এইখান থেকেই ভিতর ও বাহিরের কারুকাজ শুরু হচ্ছে।

ভিতরে বাহিরে

অমৃতলাল গৌরবর্ণ, হালকা মেয়েলি তনুময়তা, চোখে স্বপ্ন, দীর্ঘ বেপথু কেশদাম। সে রসিক, তার পানাসিক্ত জিহ্বা থেকে বচন উদগত হয়। ওর ডাকনাম ভুনি। লেখক বলেছেন ভুনি খিচুড়ির মতোই সে ঈষৎ তপ্ত গব্য ও পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনমণ্ডিত। অর্ধেন্দুর রসবোধ অমৃতর দ্বিগুণ। অমৃত যেমন থিয়েটার প্রাণ তেমনি অর্ধেন্দু মুস্তাফী। ডাকনাম অদা। ছোটবেলায় হাঁ করে সে দেখত বিদ্যাসুন্দর পালা, সে শুরু করল

মিমিক্রি। একবার ওড়িয়া পালকি বেহারা, একবার ইস্কুলের ঠ্যাঙাড়ে শিক্ষক। ইতিহাসের পাতা থেকে ব্রাত্য বসু কীভাবে যে খনন করে বিচিত্র সব সত্য তুলে এনেছেন তা হতবাক করে। অর্ধেন্দু-পরিবার প্রতিপালক পাথুরেঘাটার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নিন্দা করে তৈরি নাটকে অর্ধেন্দু না বুঝে যুক্ত হন। ব্রাত্য বলছেন অর্ধেন্দু হলেন ''শরিকী কাজিয়ার প্রধান ঘুঁটি''। ফলে পাথুরেঘাটার রাজবাড়ী থেকে বিতাড়িত হলেন অর্ধেন্দু। এই কাহিনিটি ব্রাত্য কোন জাদুবলে আমাদের কাছে হাজির করেছেন তা আরেক জাদু। অমৃত ও অর্ধেন্দু স্কুলের চেনা — পরে যখন তাদের দেখা হল তখন অমৃত যেন অন্য অর্ধেন্দুকে দেখল। ব্রাত্য বলছেন অমৃত বুঝল দুজনারই আছে রসবোধ এবং জীবনকে তির্যক চোখে দেখা সারল্য। দুজনার রসানুভাব ও প্রকাশ ''তিক্ত আঁশটে ও খরশান''।

ব্রাত্য বলছেন — ''পারিপার্শ্বিক নির্বুদ্ধিতা, হামবড়াইপনা, সবজান্তা গিরি, মিথ্যাচার, ওপর চালাকি, ঠগচাচাসুলভ ছোট ছোট অন্তরঙ্গ প্রতারণা ইত্যাদি হামেশা পরিলক্ষিত মনুষ্যপ্রবৃত্তি, তাদের অন্তরে উক্ত অম্লভাবের পাচন এবং জিহ্বা থেকে এক তিক্ত রসের উদগমন ঘটায়। প্রকৃত প্রস্তাবে সেখানেই তাদের দুজনের হৃদয়ের গঙ্গাযমুনা বা হরগৌরীর সার্থক ঝাল-টক সম্মেলন''।

এইটি লেখক অমৃতর দেখা হিসেবে দেখালেও এইটি ন্যারেটরের দেখা এবং ব্রাত্য বসুর নাটকে যে তির্যক আঁশটে বার্তা আমরা পাই — সেই সংলাপশৈলীর ও বিষয়ের একটি রূপ এই গদ্যে ধরা দেয়। ইতিহাস খনন করে বাংলা থিয়েটারের আজন্ম সঙ্গী ''আকচা আকচি''-কে দেখান লেখক। কে বড়? গিরিশ না অর্ধেন্দু? উভয়দিকেই ফুঁ দেওয়ার লোক ছিল। যখন গিরিশ বেশি প্রতিষ্ঠা পেয়ে থাকেন তখনও অমৃতলাল লিখেছেন যে অর্ধেন্দু বিধাতার হাতে গড়া 'একটার' ও অতুলনীয় নাট্য শিক্ষক।

এই লেখা এক চালচিত্র, তাই সেই সময়ের সমস্ত মানুষকে স্থান দিয়েছেন লেখক বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এবং অনেক কিছুই যা আমরা জানতাম না সেইসব যোগ ও সূত্রগুলিকে ছবির মতো এনে দেন চোখের সম্মুখে। গিরিশচন্দ্রের উত্থানের সম্পূর্ণ কাহিনি চতুর্থ পরিচ্ছদে বিধৃত। পেশাদার থিয়েটারের চার নায়ক — অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, ধর্মদাস সুর, নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় এবং ভুবনমোহন নিয়োগী। শ্যামবাজার নাট্যসমাজ থেকে এল ন্যাশনাল থিয়েটার। নীলদর্পণ অভিনয় থেকে রোজগার হল। এবং পরে বেনামে গিরিশ নাকি এই নীলদর্পণের নিন্দা করেন ইণ্ডিয়ান মিরর কাগজে চিঠি লেখে। গিরিশ নাকি একটি খেউর লিখেছিলেন সব অভিনেতাদের ব্যঙ্গ করে। তাই নিয়ে মজা হত। ব্রাত্য বলছেন এই কোরাসে একজন গলা মেলাত না — সে হল অর্ধেন্দু।

বেশ্যাদিগের থিয়েটারে প্রবেশের বিষয়টা সামাজিক ইতিহাসের অন্যতম অঙ্গ। এই নিয়ে নানান স্থানে লেখক নানান অভিনেতার মন নিয়ে বলেছেন। অমৃত ভাবতেন এরা নাচতে গাইতে পারলেও উচ্চাঙ্গের অভিনয় পারবে না। কিন্তু তাদের নিয়মানুবর্তিতা এবং শেখবার ইচ্ছা এবং শীলতা অমৃতকে বদলে দেয়। ব্রাত্য বলেছেন কথক হয়ে ''অমৃত এও পরে বুঝেছে সমাজের একটা অংশই আসলে চায় থিয়েটারে লোকরা গরিব থাক, আর মেয়েরা থাক বেশ্যা।'' অমৃত তাদের ভগিনী বা সখি মনে করত। এদিকে অর্ধেন্দু শেখাচ্ছেন গোলাপসুন্দরীকে । আমরা জানছি হরিমতী বা গুলফাম হরি নামক অভিনেত্রীর রসিকতা। ব্রাত্য বিবরণ দিচ্ছেন ''গায়ের মাজা রং, লম্বা চওড়া চেহারা, হাস্কি ভারী গলার আওয়াজ, বেশ রসে পুরু ঠোঁট আর তেমনি খচরি বুদ্ধি''।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে তিনকড়ি দাসীর সংবাদ পাই। গিরিশ জানতেন জীবন একটা ট্রেন, যাত্রী ওঠে, যাত্রী নামে। বিনোদিনীর নামে থিয়েটার করতে পারেননি। শেষ জীবনে তিনকড়ি নিয়ে ম্যাকবেথের সূচনা। বিনোদিনীর ঝাঁজ ছিল, তিনকড়ি বরং শান্ত। এই সময়ে দানী-র সঙ্গে পিতা গিরিশের যে বিবাদের সম্পর্ক

তা বিবৃত হয়েছে অতি সুন্দর। এই সম্পর্কের ইতিবৃত্ত আমাদের কাছে একেবারে নতুন এবং এই সম্পর্ক থেকে একটি নাটক অবধি রচনা হতে পারে। প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত দানীকে গিরিশ থিয়েটারে আনতে চাইতেন না। দ্বিতীয়া স্ত্রীর মৃত্যু হল কুড়ি বছর বয়সে। দানী এক রাতের জন্য এমারেল্ড ভাড়া করে 'পলাশীর যুদ্ধ' অভিনয় করে। বারবার আলোর ব্যাঘাত হচ্ছিল। এ হল এক রকম সাবোতাজ। গিরিশ বলেছিলেন, লিখছেন ব্রাত্য, যে এরা মানে যুবকের দল পেশাদারদের চেয়ে ভাল অভিনয় করে। দানীর প্রেমের জীবনটি মারাত্মক। এক বিধবা নারায়ণীকে তিনি ভালবাসেন, তার সন্তানদের নিজের সন্তান ভাবেন। বর্ণহিন্দু গিরিশের অন্তরে কায়স্থের অভিমান — এই মেয়েটি গোয়ালা — দানী এই মেয়েটিকে বিবাহ করে পিতার গোঁড়া মতের বিরুদ্ধে গেলেন। তাহলে ব্যক্তিগত জীবনে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের রচয়িতা ছিলেন গোঁড়া? এক ইতিহাসসিদ্ধ বিপরীতমুখী চরিত্রের সামনে এনে দেন ব্রাত্য।

''বলিদান'' নাটকে করুণাময়ের ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করলেন গিরিশ। রূপচাঁদের চরিত্রে অর্ধেন্দু উইংসের পাশ থেকে দেখতেন। দশ নম্বর রজনীতে গিরিশ অসুস্থ, অভিনয় করলেন করুণাময়-এর চরিত্রে অর্ধেন্দু। ব্রাত্য বলছেন, ''গিরিশের করুণাময় যদি হয় প্রজ্ঞাবান দার্শনিকের শুষ্ক কঠোর সন্দর্ভ, অর্ধেন্দুর করুণাময় তবে গীতিকবির উচ্ছলিত বিরহশ্লোক।'' এদিন রাত্রে ভুনিকে পত্র লিখছেন অদা।

পত্রটি পাঠক পড়ে নেবেন ধ্যানস্থ হয়ে। দেখবেন কী অসাধারণ ভাবে সমস্ত পুরনো থিয়েটারের ইতিহাস, আপন জীবনকথা কথিত। আর এইখানেই পাই তিনকড়িকে পার্ট তোলানোর ইতিহাস। অর্ধেন্দু শেখাবেন। অর্ধেন্দু ছোটখাট পার্ট পাবেন — অনেক টাকা পাবেন। তিনকড়ি পড়ল ক্রমে অর্ধেন্দুর প্রেমে। অর্ধেন্দু তার অনুরাগ অস্বীকার করে অভিনয় শেখানো নিয়ে পড়লেন। একদিন গিরিশ টের পেলেন এবং শেখানো বন্ধ। ব্রাত্য বলছেন তাঁর (গিরিশের) ভিতরে উজ্জ্বল সোনালী সিংহ আর কৃষ্ণবর্ণ বৃশ্চিক বসবাস করত এবং একদিকে অত্যাচারী আবার চরম অধিকারপ্রবণ স্বামীর মতো করে থিয়েটারকে ভালবাসতেন। এই চিঠির জবানিতে উন্মোচিত হল আমাদের গদ্যসাহিত্যের এক নব্য বয়ান। লেখক বর্তমানে শ্রেষ্ঠ নাট্যস্থপতি, তিনি অতীতের সিংহদের কথা বলছেন তাঁদের বকলমে — পরে এমনভাবে সরে আসছেন যে ওই ন্যারেটরকে আমরা খুঁজছি এবং আবার পেয়ে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে ইতিহাসের সমস্ত সূত্রকে একীভূত করার জন্য 'প্রসঙ্গকথা' লিখছেন। এটি একধরনের ডাইগ্রেশন। মূল কথাটি বোঝানোর জন্য সমস্ত দিনলিপির তথ্যকে পরপর সাজানো এবং আবার মূল রচনায় ফিরে আসা। উপন্যাসকে স্বাদু করে তোলবার জন্যে, ইতিহাসের ভিত্তিতে, যে সাধারণ চলন আছে, যার চমৎকার রূপ আমরা পাই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে যেখানে ঘটনা ও সম্পর্কের তীব্রতা আছে এবং বেশ খানিকটা কল্পনার আশ্রয় লাভ ঘটে। এই থিয়েটারের ইতিহাসের ভিত্তিতে ব্রাত্য বসুর রচনা আগেই বলেছি সমস্ত চলন থেকে পৃথক। সুনীলের ''নিঃসঙ্গ সম্রাট''-এ যে শিশির তাতে নাটক বেশি। ব্রাত্য বসুর লেখায় ইতিহাসের গতিপ্রকৃতির ভিত্তিতে সত্যের উন্মোচন ঘটছে যার মধ্যে সেই অর্থে কাল্পনিক ঘটনার স্পর্শ খুবই কম। শিশিরকুমারকে নিয়ে উপন্যাসে কেবলমাত্র শিশিরের সঙ্গে পিতার মায়া-যোগাযোগ হয় জাহাজের ডেকে। আবার অমৃত দেখছে আকাশে উড্ডীন অদা ঘোড়ার পিঠে। এক অসীমের চিহ্ন দুই লেখাতেই।

লেখায় বিভিন্ন কূট-কচালি এবং নানা রসিকতার কাহিনি সংযুক্ত আছে যা মানুষগুলির মধ্যে বিচিত্র প্রাণশক্তি এবং থিয়েটারের রঙ্গ-বিবাদ-বন্ধুতাকে প্রকাশ করেছে। এই কাহিনিবয়ানে ন্যারেটার সবার মধ্যে প্রবেশ করে মৃদু হেসে যেন অভিনয় ক'রে ক'রে সংলাপ বলছেন। এক পণ্ডিত পরিশীলিত রসিক আমুদে লেখক ইতিহাসের ভোলবদলের কথা বলছেন যে থিয়েটারের বর্তমান অগ্রপথিক তিনি নিজে।

উন্মোচন

১৯০৮-এর ৯ আগস্ট অর্ধেন্দু শেষবার মঞ্চে ওঠেন। গিরিশের প্রফুল্ল নাটকে যোগেশ, নবীন তপস্বিনীতে জলধর। তখন অর্ধেন্দু বেশ অসুস্থ। এর একমাস পরে তিনি চলে গেলেন। এখানে অর্ধেন্দুর কোনও মঞ্চ ছিল না। ব্রাত্য গিরিশকে বলেছেন ''আরেক পাকা মঞ্চবিহীন, ভবঘুরে'' — এই গিরিশ চলে গেলেন ১৯১২-র ফেব্রুয়ারিতে।

''পুঁজি বনাম প্রতিভার লড়াইতে প্রতিভা পুঁজি-আশ্রিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু পুঁজি শেষ পর্যন্ত প্রতিভাকে পোঁছেনি। দুজনেই তাঁদের থিয়েটারি জীবন প্রায় বাজিতে তুলে দিয়েছিলেন। বিনিময়ে প্রধানত গুমোট ঘেমো ও শাসানি-প্রদর্শনকারী একটি বদ্ধ সমাজ থেকে তাঁরা ঠিক যা পেয়েছিলেন, শতাব্দান্তরে তার হিসেব এখন করতে না বসাই সংগত হবে''।

ভক্তেরা অর্ধেন্দুর চিতায় বাংলা মদ ঢেলে দিলেন। তারপর আগুন। দূরে স্তব্ধ গিরিশ ও অমৃতলাল।

অমৃতলাল মারা যান ১৯২৯-এর ২ জুলাই। শেষ জীবনে কিছু সিনেমা করে নাম করেছিলেন। অষ্টম পরিচ্ছদে মূলত অমৃতলালের সঙ্গে হেমেন রায়ের যোগ। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে উৎসাহ, শিশিরকুমারের সংবাদ হেমেন রায়ের মুখে। তারপর রাত্রে ভরা চাঁদের আলোয় দেখছেন শূন্যে এক ঘোড়া, নীল রঙের। ঘোড়ার উপরে বসে অর্ধেন্দুশেখর — সাহেবের পোশাক।

''তার দৃষ্টি সামনের দিকে নিবদ্ধ। যেন সুদূরপানে তাকিয়ে আছে। তার মুখ শান্ত এবং স্নিগ্ধ শুধু তার পুরো শরীরে চাঁদের আলো পড়ে এক তীব্র নীলবর্ণ জ্যোতি বেরোচ্ছে।'' এবং ''চেতনা চলে যাওয়ার সামান্য আগে নাট্যাচার্য দেখতে পেলে, অদা-আরূঢ় নীল ঘোড়াটি তখনও অনেক উপরে চাঁদের কাছে আকাশের কালো মেঘের ভেতরে মিলিয়ে যাচ্ছে।''

এই জাদু বাস্তবের পরিকল্পনায় লেখক একশো ভাগ সফল। কিন্তু এই স্বপ্নমেদুর বয়ানের পরেই ব্রাত্য চলে আসছেন অমৃতলালের শুকনো দাম্পত্য এবং তারাসুন্দরীর সঙ্গে অমৃতলালের সম্পর্কলীলায়।

''বাইরে অতি সুভদ্র এবং ভিতরে চরম নাশকতাবাদী'' অমৃতলাল কিশোরী তারার পোশাক কমাতে শুরু করলেন — এই নাটকে তারার অনাবৃত উদর, ব্রাত্যের ভাষায় ''উদারা-মুদারা সমেত'' পরিদৃশ্যমান হল যা ''বারেন্দ্র ইলিশের ঝকমকে আঁশের মতো''। শৈবলিনী চরিত্রে তারাসুন্দরী ''পুরু মজালসা ঠোঁট, ভারী বুক আর পৃথুলা পশ্চাদ্দেশ নিয়ে'' হল সেক্স সিম্বল। তারপর বাবু অমরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে পালায় শৈবলিনী। এদিকে চন্দ্রশেখর অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে অমৃতলাল শোকাহত। ব্রাত্য বলেন ''আমও গেল, ছালাও গেল''। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক গেল প্রায় শেষ হয়ে।

এবার লেখক তার সহজে আয়ত্ত জাদুর ব্যবহার করেন। ভুনির সঙ্গে অমৃতর দেখা। আয়নায় ভুনি অমৃতর সমস্ত গোলমালকে সামনে আনে, বলে

''বজ্জাত বোসের পো মঞ্চে কোনরকমে একটা ছ্যাবলামো করতে পারলে আর মূর্খ পাবলিকদের শাঁকালুর মতো দাঁত বার করাতে না পারলে তোমার পেটের ভাত হজম হয় না তাই না?''

স্ত্রীকে অপছন্দ করতেন অমৃত। লিখেছেন

''বিবাহতে পুরুষের হয় সংঘটন / স্বাধীনতা স্বর্গ হতে প্রথম পতন''

ভুনি জানতে চায় এত রাগ কেন স্ত্রীর উপরে? শিক্ষিত মহিলাদের উপরে? নিজের ভেতরের নারীর সঙ্গে কলহ-মধুর সংলাপ বিনিময় যেভাবে ব্রাত্য রচনা করেছেন তা ঈর্ষাযোগ্য।

''আধা জটিলতায়, আধা কামনায়, আধা হতাশায় আমি নিজের ভেতরে পুড়ি। সেই পোড়ার ফোসকা আমার লেখায় বেরোয়, আমার শিল্পে। আমার ভেতরের মহিলাটিকে আমি ভয় পাই ভুনি।''

উপসংহার

অদামৃতকথা আখ্যানের অন্তিমে যে মায়াবী ও মায়াবাস্তবতার কথা বলছেন লেখক সেটি হল ঘোড়ায় চড়া অর্ধেন্দু ও অমৃতর দেখা। এটি স্বপ্নপ্রয়াণ যেন বা। প্রারম্ভে লেখক অমৃত বা ভুনি এবং অর্ধেন্দু বা অদা-র রসায়নের ক্রমবিন্যাসের মুখপাত করেন। তা' পর্বে পর্বে সংযোগ নিয়েছে চারিপাশের সঙ্গে। বঙ্গ থিয়েটারের সমস্ত গতিপ্রকৃতির এতটাই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবৃতি যে একটি গবেষণা সন্দর্ভ পড়ছি বলে মনে হয়। স্বাভাবিক বাংলা গদ্যের সঙ্গে ভারি তৎসম শব্দের প্রয়োগ যে ব্যঞ্জনা আনে তার বিশেষ মূল্য আছে আমাদের গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে। এমত সাধু মিলমিশ কেবল যে পড়ার জন্য উত্তম তা নয়। নিরীক্ষা হিসাবে অতি উচ্চমানের। এই গদ্যে, আগেই বলেছি ন্যারেটারের একটি অ্যালিয়েনেশন আছে যেটি নাটককারের অন্তর্দৃষ্টি ও দর্শন থেকে তৈরি হয়। নাটক রচনায় ব্রাত্য যে মধুর ও কষায় রস একত্রে পরিবেশন করেন সেই রস পান করেই যেন সমস্ত ঐতিহাসিক চরিত্ররা এই উপন্যাসে আসে। ইতিহাসের বেপথুমান চলাচলে যে সত্য বহমান সেই নিন্দা, দলাদলি, সাবোতাজ, অর্থ রোজগার, প্রেম, নারী-গমন, বেশ্যা-ব্যবহার, তৈলমর্দন, কর্তাভজা মনোভাব, ব্যক্তিগত সম্পর্কের মিথ্যাচার ও গললগ্ন অবস্থা — এই সবই মহাকাল দিয়েছেন বাংলা থিয়েটারের সঙ্গী করে, প্রকৃতপক্ষে শিল্প নির্বাহকারী মনুষ্য মরমী ও নিষ্ঠুর, উদাসীন ও পরশ্রীকাতর, অসাধারণ শিক্ষক, আবার ভাল ছাত্রের আঙুল কেটে নেওয়া — এই সব বিষয়ে সে দক্ষ। মানুষ ভাল না হলে থিয়েটার হয় না — এই কথ্যচলটি ইতিহাসের নিরিখে ন্যাকামো। বিস্তর মন্দ মানুষ ভাল থিয়েটার করেছেন। এইখানে মন্দ বলতে আমি সাদা-কালোর মিশ্রণকে বোঝাচ্ছি।

দ্যূতক্রীড়ক-এর অন্তিমে পড়ি —

> ''শিশির কুমার দেখলেন ডেকের এক কোণে পাশ ফিরে তার মৃত পিতা হরিদাস ভাদুড়ি দাঁড়িয়ে আছেন''

মৃত বাবাকে দেখছেন শিশির। তর্ক হচ্ছে পিতার সঙ্গে। পিতা বলছেন থিয়েটার কাল্পনিক অলীককুসুম স্বপ্ন। বলছেন

> ''কঙ্কাবতীকে ঠিক করে খেতে দিতে পারবে তো দুমুঠো? কি হে অপটু জুয়াড়ী?''

হরিদাস ঝাঁপ দিলেন সমুদ্রের জলে।

অদামৃতকথার শেষের জাদু আর দ্যূতক্রীড়ক-এর শেষের এই কল্পনা সংলাপ একই গোত্রের — একইভাবে সমস্ত বাস্তব চলন ও চালচিত্রকে মেনে লেখা উড়াল দেয় অসীম গগনে। অদামৃতকথায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে একেবারে শিরে আনন্দ বকসীর লেখা নমকহারাম চিত্রে ব্যবহৃত গানের কথা লেখা।

> ''বড়ি মুশকিল সে মগর, দুনিয়ামে
> দোস্ত মিলতে হে''

পঞ্চম বেদ অবলম্বনে থিয়েটার তাড়িত দুরাকাঙ্ক্ষ মানুষের বৃথা ভ্রমণের মতো পদতলে কুশের আঘাত নিয়ে রক্তমাখা পদছাপ ফেলে চলেছে আমাদের থিয়েটার। ব্রাত্য বসুর গদ্য উপক্রম একটি দর্পণ হেন। মিছিলের সব মুখ দৃশ্যমান যদিও দর্পণটির পারদ নষ্ট হয়ে গেছে খানিক — প্রতিবিম্ব সদবিম্ব না অসদবিম্ব আজ বুঝতে পারছিলাম না। এক মায়াবী পিদিমের আলো অতীতকে স্পষ্ট করে দিল। একদম নূতন ধারার সূচনা হল বাংলা গদ্য ইতিহাসে থিয়েটার-এর ইতিহাস ও তার দাহ নিয়ে। এক আকর গ্রন্থ এই অদামৃতকথা।

উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় : প্রখ্যাত নাটককার ও মৌলানা আজাদ কলেজের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক।